ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — সময়ের দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের নির্মাণ

অভিষেক মুসিব

বাংলা সাহিত্যচর্চার জগতে ঊনিশ শতকের সময়টা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলা সাহিত্য বলতে যা তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য রোমান্টিক প্রণয়কাব্য -সে সমস্তই গড়ে উঠেছিল লোকজীবনকে একান্তভাবে আশ্রয় করে। কিন্তু ঊনিশ শতক থেকেই নগর কলকাতা এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে থাকে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা যেটি ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে মূল ধারার জায়গা করে নেয়।

ঊনিশ শতককে বলা যেতে পারে বিদ্রোহেরও শতক। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহের মতন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে এই সময়। কিন্তু তথাকথিত ঐ বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় তার কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছে না- একমাত্র নীলদর্পণ ছাড়া। স্পষ্টতই বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে মূলধারাটি ক্রমশ যার জন্ম দিচ্ছে তাকে আমরা বলবো ভদ্রলোকের সাহিত্য। সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা সিপাহী বিদ্রোহের মতন বড় বড় ঘটনা বাংলার গ্রাম সমাজে আমাদের oral tradition এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ছাপ রেখে থাকলেও ইউরো কেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন আমাদের মূলধারাটি সে সম্বন্ধে একটি কথাও খরচ করে নি।

লক্ষণীয় একজন ব্যক্তি অবশ্যই কথা বলছেন এইসব নিয়ে, কিন্তু তিনি এর বিরুদ্ধে বলছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সমাজের উপরিভাগে ক্লেদ-পঙ্কিলতা লক্ষ করে ঈশ্বর গুপ্ত সমকালীন জীবনধারার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। সমাজ জীবনের অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে সংস্কারের চেষ্টা তিনি করেছেন কিন্তু তা সাংবাদিকের মতো, শিল্পীর মতো নয়। আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে কবিতাই তিনি কেবল লিখছেন না , সংবাদ প্রভাকরের পাতায় খোলাখুলি আবেদনও তিনি রাখছেন ইংরেজ সরকারের কাছে বিদ্রোহগুলি দমনের জন্য।

এহেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আমরা পাচ্ছি বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে, বলা যেতে পারে প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে। পশ্চিমি রেনেসাঁসের হাত ধরে আধুনিকতা আসার সময় মানুষের অনেকখানি সংস্কার মুক্তি ঘটেছিল। বাংলার বিতর্কিত নবজাগরণও মানুষের চিন্তার জগতে একটা পরিমাণ মন্থন তৈরী করতে পেরেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা কবিতা সেই আধুনিকতার উদ্বোধন হয়েছিল যার হাত ধরে, তিনি কিন্তু একেবারেই রক্ষণশীলতার ছোঁয়াচমুক্ত নন। আবার তাঁকে সম্পূর্ণ রক্ষণশীলও বলা যাবে না। এক অদ্ভুত বৈপরীত্য ঈশ্বর গুপ্তের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে নিয়ত নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই দেখা যাবে 'সংবাদ প্রভাকর'এর পাতায় সমালোচক ঈশ্বর গুপ্ত অনেকটা উদারতার পরিচয় দিলেও কবিতার ঈশ্বর গুপ্ত ভীষণ রকম রক্ষণশীল। তাই দেখা যাবে নারীশিক্ষা-নারীস্বাধীনতার

Scanned by CamScanner

পক্ষে দারুন গলা না ফাটালেও মোদ্দায় এই প্রকল্পকে যিনি সমর্থনই জানাচ্ছেন, তিনিই আবার কবিতায় লিখছেন 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে' ইত্যাদি। আবার কখনো দেখি ইংরেজদের প্রতি অকুণ্ঠ অশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বন্দনা করেছেন, কখনো ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,'নেটিভের কাছে শিক্ষা? নেভার নেভার'। এই বৈপরীত্য সবচেয়ে প্রকট তাঁর সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে। সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে তিনি নিশ্চিত প্রাচীন পন্থী। তাঁর প্রবন্ধে তিনি বারংবারই eurocentricism নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও ঘটনাচক্রে তাঁর কবিতাতেই eurocentric আধুনিকতার প্রথম পদধ্বনি।

কবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্ত দারুন কোন প্রতিভার অধিকারী নন। নানান বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলি আজকের দিনের পাঠকের কাছে হাস্যকর বলেও মনে হতে পারে হয়তো কখনো। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ঈশ্বর গুপ্ত যে সময়ে বসে কবিতা লিখছেন সেই সময় তাঁর সামনে কোন আদর্শ কবিতার মানদন্ড তৈরী হয়নি। তার পরেও তাঁর কবিতায় এবং প্রথম তাঁরই কবিতায় আধুনিকতার অস্ফুট কণ্ঠ ব্যক্ত হবার আর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। তাঁর কবিতায় তোপসে মাছ, ছাগল এমনকি আনারসের মতন বিষয় নির্বাচন - বিষয়গুলি যেমনই হোক, যত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হোক , ঊনিশ শতকের পটভূমিতে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতাবৎ বাংলা কাব্যে চলে আসা আখ্যানের ভার সরিয়ে ফেলবার একটা অজ্ঞান চেষ্টা আমরা এর মধ্যে অনুভব করতে পারবো। তার কবিতা আর একটি দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল ধর্মাশ্রিত 'মহতী' গাথার বদলে ইহকাল-ইহলোকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসেরও কবিতার মন্ডলে স্থান করে নেওয়া। ধর্মের খোলস সম্পূর্ণ খসে গিয়ে ইহজীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য সাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ তাঁর ইতিহাস চেতনায় প্রতিবিম্বিত। যদিও এ চেতনা অস্ফুট তবুও বাংলা সাহিত্যে এ বস্তু তাঁর আগে কোন লেখকের রচনায় ও প্রচেষ্টায় দেখা যায় না। ইতিহাস চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তিনি কয়েকজন ব্রাত্য কবিওয়ালাদের গান ও ছড়া সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত কোন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রকে তাঁর পত্রিকায় স্থান দিলেন না। এখানে কবিওয়ালাদের জীবনীকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরেন। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম দেখান যে এই তুচ্ছ অপাংক্তেয় বলে যে সমস্ত কবিওয়ালারা সমাজে অপরিচিত ছিল তাদেরকেও সাহিত্যে স্থান দিতে হবে কারণ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এঁদের সুদূর প্রভাব রয়েছে। এর কিছুকাল পর ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৫ খ্রিঃ একজন কবির ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস নিয়ে বই লিখলেন যার নাম 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত'। এই বইটি বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম কোন একজন কবির জীবন সম্পর্কে আলোচনা। এই বইয়ের দ্বারা আমরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধর্মীয় মানুষের ইতিহাস পেলাম- এ এক ঈশ্বর গুপ্তের অনন্য কীর্তি।

নানা সামাজিক ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা একটা বিষয়কে স্পষ্ট করে দেখায় - সেটা হল আধুনিক 'ব্যক্তি'র নির্মাণ - যে কিনা ব্যক্ত হতে চায়, যে কিনা পারে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা -সংঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিক মতামতকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আর একটি ব্যাপার লক্ষ করার মত তা হল সময়ের ধারনা।

Scanned by CamScanner

প্রাচ্য সময় -ধারনার মধ্যে একটা অখন্ডতার বোধ আছে- তা হল কালনিরবধি। যে কারণে প্রাচ্যে ট্রাজেডি তৈরী হয়নি। গুপ্তকবির কবিতায় প্রথম মুহূর্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে কালের খন্ড ধারনা। রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন—

"No renowned poet appeared in Bengal in the First half of the present century, and Iswar chandra (Gupta) was the reigning king of the literary world in his day".

ঈশ্বর গুপ্ত পুরানো কবিতাকে বিদায় দিয়ে নতুন কবিতাকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন এমন কথা বলা যায় না, তাঁর কবিতায় যুগসন্ধির বাণীও উচ্চারিত হয় না কিন্তু তিনি নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে দুই যুগকে এক সঙ্গে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রতিভার বিচারে অনেক পিছিয়ে থেকেও যুগ বৈশিষ্ট্যকে অনেক বেশি ধারন করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সে কারণে তিনিই হয়ে পড়েন বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা।

"...আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রান, কারখানায় কারখানায় তোলে ঐক্যতান।" (অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলেরে মুখে নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।" (বিবৃতি —সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

Scanned by CamScanner